গ্রামীণ স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ভগ্নদশায় ।। ওঝা-গুনিনের প্রশিক্ষণ কেন নয়

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন হাতুড়ে বদ্যিদের আধুনিক সংস্করণ হল 'কোয়াক' ডাক্তার । দরিদ্র গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থার ন্যূনতম সুযোগের চূড়ান্ত অভাব 'কোয়াক'দের পসার বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে । অসহায় গ্রামীণ মানুষ অসুখ-বিসুখ-বিপদে ওঝা গুণিন আর কোয়াকদের ছাড়া ভরসার জায়গা পায় না। জায়গা নেই । ফলে ভুল চিকিৎসা, অপচিকিৎসা, হাতুড়ে চিকিৎসায় সর্বনাশ হলেও কোনো বিকল্প নেই । এখনো প্রত্যন্ত এলাকার অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের সন্তান প্রসব হয় অ-শিক্ষিত অ-প্রশিক্ষিত 'দাই'দের হাতে; বাঁশের ধারালো চোঁচ কিংবা ব্লেড দিয়ে নাড়ি কাটা হয় আজও । পরিণতি যা হওয়ার তাই হয় । উপায় তো কিছু নেই !

পুরুষানুক্রমিক গ্রামীণ পেশা হল সর্পদংশনে ওঝা-গুনিনের চিকিৎসা । সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিষধর সাপের কামড়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ মরে, তার মধ্যে দক্ষিণ ২৪-পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে মৃত্যু সর্বাধিক । প্রধানত কালাচ আর পদ্ম কেউটের ছোবলে আক্রান্ত হয় সুন্দরবনের গ্রামগঞ্জের আধুনিক-চিকিৎসা-বঞ্চিত মানুষ। জেলার ৩৫টি ব্লকের মধ্যে ১৯-ব্লকের সুন্দরবনের প্রায় ৩৬ লক্ষ গ্রামীণ অধিবাসীর দিনরাতের সঙ্গী এই সর্পদংশনের আতঙ্ক । ভয়-ভীতিতে ভরসার স্থল কিন্তু ওই ওঝা-গুনিনরাই । আজও অপরিবর্তিত সে চিত্র ।

ভরা বর্ষায় জলের ঢল নামে, আর মাতলা বিদ্যেধরী রায়মঙ্গল দিয়ে ভেসে চলে মান্দাস, যখন তখন, সাপে-কাটা মৃতদেহ বুকে নিয়ে । প্রতিবছরের ছবি । কতগুলো মড়া ? কোনো হিসেব নেই । কে হিসেব রাখে দারিদ্র-বঞ্চনা-অনটনে জর্জরিত দ্বীপবাসীদের জীবন-মরণের ! সরকারি নথিতে আছে ২০০১ সালে সর্পদংশনে এ রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২০৬ । এ পরিসংখ্যান যে কত হাস্যকর, কত করুণ রসিকতা, সেটা সুন্দরবনের অধিবাসীমাত্রই জানেন । প্রত্যক্ষ সমীক্ষা হয় না বললেই চলে । আদর্শগত কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে ছোট্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (NGO নয়) 'ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা'র সদস্যরা ২০০১ সালে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সর্পাঘাতে মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করে -- সুন্দরবনের ৪টি ব্লকে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে; এই হিসেবে ৩৫ ব্লকের জেলা দক্ষিণ ২৪-পরগনায় সর্পঘাতে মৃত্যু দাঁড়ায় ১২৬ । তাহলে রাজ্যের ১৮টি জেলায় মোট সংখ্যা, আর যাই হোক, হাসপাতাল রেকর্ডের ২০৬-এর থেকে যে বহু বহুগুণ বেশি তা সহজ অঙ্ক থেকেই বেরোয় ।

যারা মরে তাদের অধিকাংশই গরীব হাভাতে ঘরের মানুষ (শহুরে বাবুদের সাপেরা কামড়ায় না, এড়িয়ে যায়)। যাবে কোথায় তারা বিষধর সাপে আচমকা কামড়ালে ? রাস্তাঘাট, বিজলিবাতি, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, আধুনিক চিকিৎসাপত্র কিছুই যে ত্রিসীমানায় নেই । মরণের মুখে ভরসা তখন ওঝা-গুণিন, যাঁদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার তিলার্ধ সুযোগ নেই, বাপ-ঠাকুরদার শেখানো টোটকা গুনিনবিদ্যা প্রয়োগ করেন তাঁরা রোগীর শরীর থেকে বিষ তাড়াতে । সর্পাঘাতে বিপন্ন রোগীর মাথায় সুপুরি ঠোকা, পোড়া গামছার বাড়ি, শেকড়-বাকড় গেলানো, ক্ষতস্থান চিরে মুখ দিয়ে বিষ টানার চেষ্টা, আর অনর্গল মন্ত্রের শাসন --- নিজস্ব বিদ্যায় সব চেষ্টাই করেন ওঝা-গুনিনরা আন্তরিকভাবেই, মানুষকে বাঁচানোর সদিচ্ছার অভাব থাকে না । কিন্তু বিষধরে কাটলে তো আধুনিক ওষুধ AVS (অ্যান্টিভেনিন সিরাম) ছাড়া আর কোনো উপায়েই রোগীকে বাঁচানো যায় না ! একথা এখন ওঝা-গুনিনরা কেউ কেউ জানেন তবে সঙ্গে এটাও জানেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে কখনোই এ ওষুধ মেলে না। অতএব অসহায় গ্রামবাসীদের কাছে গুনিনরাই পরিত্রাতা, প্রায় ভগবানের সমতুল্য ।

বহুকাল ধরেই গ্রামীণ ওঝা-গুনিনদের কুসংস্কারগ্রস্ত বুজরুক প্রতারক বলে অনায়াসে চিহ্নিত করে আসছে প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজ, আগুয়ান বিজ্ঞানকর্মীরাও । অথচ কেউই গিয়ে দেখেনি দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁদের অবস্থান কোথায়, অনুধাবন করার চেষ্টা করেনি তাঁদের ভাষা, তাঁদের মানবিক পেশা, তাঁদের সামাজিক-অর্থনৈতিক

প্রতিকূলতার দশা । কালেভদ্রে ভোটপ্রার্থীরা গেছেন সেসব অঞ্চলে ভোটের ভিক্ষাপাত্র হাতে; সমাধান-প্রয়াসের হাত শূন্য । সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকের মধ্যে মাত্র ৫/৬ টি হাসপাতালে সাপের বিষের জীবনদায়ী ওষুধ AVS মজুত আছে । শহর কলকাতার সব কটি হাসপাতালেই অবশ্য এ ভি এস (AVS) পর্যাপ্ত, কাজে লাগে নামমাত্র । ওদিকে ক্রমাগত ভেঙে ধসে তলিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা । প্রতিকারের লক্ষণ নেই । এমনকি ২৬ বছরের পরিণত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবুদ্ধিও মুখ ঘুরিয়ে নির্বিকার ।

সুন্দরবন অঞ্চলের ১৭ হাজার গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই রয়েছে ওঝা-গুনিনদের একচ্ছত্র প্রভাবের আওতায় । এক একজন গুনিনের কর্তৃত্ব গড়ে দু'তিনটি গ্রামের ৫০০/৬০০ মানুষের ওপর । এত বিরাট জনসমষ্টির ওপর এমন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যে-কোনো রাজনৈতিক নেতার ঈর্ষার কারণ হতে পারে । তাহলে প্রত্যন্ত গ্রাম্য অন্ধকারে থাকা এই প্রভাবশালী গুণিনদের গ্রামীণ স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সহায়তার কাজে লাগানো নয় কেন ? আমরা যে দূর-দুর্গম এলাকায় গিয়ে পৌঁছতে পারি না, সেখানে অবস্থান করে ওঁরা যদি কিছু প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ নিয়ে ঠিকঠাক পদক্ষেপ ফেলতে পারেন, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে AVS নিয়মিত সরবরাহের দাবীতে এলাকার জনশক্তিকে সংহত করতে পারেন, তাহলে বিরাট কাজ হয় । -- এরকম সুনির্দিষ্ট এক মৌলিক ভাবনা নিয়ে 'ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা' গত দু'বছর ধরে প্রস্তুতি ও প্রচার চালিয়েছিল। শেষে ওঝা-গুনিনদের নিয়ে 'সাপ ও চিকিৎসা' শিরোনামে একটি কর্মশালার আয়োজন করে তারা গত মাসে জুলাই ২০০২, ক্যানিং-এ । এরকম কর্মশালা বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভিনব । দুরূহ কাজও বটে । দূর-দূরান্তের গ্রাম্য ওঝা-গুণিনরা সহজে শহরে আসতে চান না, আধুনিক 'প্রগতিশীল'দের মধ্যে গেলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশঙ্কা করেন । তবু এসেছিলেন, সংস্থার কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে । পুরুষ মহিলা মিলিয়ে ৩৬ জন ওঝা-গুনিন, প্রত্যেকেরই নিজেদের গ্রামে বিরাট প্রভাব । রেদোখালী, হেড়োভাঙা, বিরাজনগর, হিঞ্চাখালী, বাহিরবেনা, ঠাকুরঘেরি, ঝড়খালী.... এরকম অনেক গ্রাম থেকে এসেছেন । তাঁদের প্রাথমিক আড়ষ্টতা, বোধগম্যতা, দ্বিধা এবং স্বাভাবিক অহমিকাকে গ্রাহ্যে রেখেই প্রশিক্ষণ ও খোলামনের আলোচনাকে কার্যকরী করে তোলেন কর্মশালা পরিচালকেরা । কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন চিকিৎসক, সর্পগবেষক, ভেষজ বিজ্ঞানী , বিশেষজ্ঞ ও গণসংগঠক ।

সাফল্য আর অভিনবত্বের শেষ দৃশ্য দেখা যায় কর্মশালার সমাপ্তিতে, ৭ জুলাই বিকেলে । জনা তিরিশ ওঝা গুণিন, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, লটবহর সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরার পথে মিছিল করে যান ক্যানিং বাস স্ট্যান্ডে । অনভ্যস্ত হাতে হ্যান্ডমাইক ধরে উজ্জ্বল মুখে তাঁরা জনসমক্ষে ঘোষণা করেন - আমরা বিজ্ঞানের অনেক কথা এখানে জানলাম। আমরা আমাদের জানা বিদ্যায় চিকিৎসা করি, এবার বিজ্ঞানের কথাও আমাদের ভাবতে হবে । বিষধরে কাটলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানোর দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে । স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপের বিষের জীবনদায়ী ওষুধ জোগানের দাবীতে আমরাও এবার থেকে সামিল হব ।

অভাবিত এই উত্তরণ। গ্রামীণ স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এমন সম্ভাবনাপূর্ণ এক সূত্রের সন্ধান দিল ছোট একটি বিজ্ঞান ও সমাজভাবনার সংগঠন, বড় এক আশার আলোর নিশানা দেখা গেল এই পরীক্ষামূলক প্রয়াসে ।

আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা কাঠামোয় শহর-বিচ্ছিন্ন বিপুল গ্রামবাংলা এতটাই বঞ্চিত ও অনাদৃত যে মনে হয়, নগরসভ্যতার বাইরে সে এক অন্য দুনিয়া -- আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সে দুনিয়ায় স্বপ্নের ছায়াছবির মত । তারা নিজেদের মত করেই টিকে আছে । সেই প্রত্যন্ত গ্রামীণ সমাজের চিকিৎসা কাঠামো স্থানীয় কোয়াক ওঝা গুনিন পীর ফকিরদের হাতেই রক্ষিত (সুরক্ষিত হয়তো নয়), কয়েক পুরুষ ধরে । তাঁদের এই কুক্ষিগত বিদ্যা ও প্রচীন পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ''বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা'' প্রতিষ্ঠা করার কোনো সুযোগ আপাতত নেই । অতএব উন্নতিবিধানের রাস্তা মনে হয় এটাই - স্বপেশায় নিযুক্ত থেকেই তাঁরা যাতে নিয়মিত ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রশিক্ষণ পান, ছোট ছোট কর্মশালার মাধ্যমে, সেরকম কর্মসূচী গ্রহণ করা । এতে অপচিকিৎসার আশঙ্কা কিছু কমবে ।

পরিকল্পিত কর্মসূচী নিলে এ কাজ কঠিন নয় । ক্যানিং-এর সাম্প্রতিক কর্মশালা এর উজ্জ্বল উদাহরণ । সদিচ্ছা থাকলে সরকারি বেতনভুক অঙ্গনওয়ারি কর্মী, সমাজকল্যাণ কর্মী, পরিবার কল্যাণকর্মীদের দূরের গ্রামগুলিতে যোগাযোগের কাজে লাগিয়ে ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবির বসানো যেতেই পারে । ধারাবাহিকতা থাকলে এ প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ সমাজের দীনহীন স্বাস্থ্যচিত্র পাল্টাতে বাধ্য । এ এক নতুন রাস্তা । হাঁটতে হবে । অন্যথায় সরকার বা ঈশ্বরের কৃপার জন্য বসে থাকা । তাতে অন্ধকারের ঘনত্ব-বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু হবে বলে মনে হয় না ।